অনন্ত জলিলের চলচ্চিত্রে নায়ক নির্মাণ

মোঃ আসাদুজ্জামান*

জুঁই সরকার**

সারসংক্ষেপ

চলচ্চিত্রে শুধু নারী চরিত্রের বিশ্লেষণ করলেই জেন্ডার নির্মাণের পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায় না। পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাবার জন্য নায়ক ও নায়িকা দুটি চরিত্রেরই রূপায়ণ জরুরি। বাংলাদেশে নায়িকা চরিত্রের রূপায়ণ নিয়ে নানা গবেষণা হলেও নায়ক চরিত্রের রূপায়ণ নিয়ে সেই অর্থে খুব বেশি গবেষণা নেই। তাই এই গবেষণাকর্মটি অনন্ত জলিলের চলচ্চিত্রের পাশাপাশি বর্তমান চলচ্চিত্রের নায়ক নির্মাণের চিত্র পেতে সহায়ক কর্ম হবে। গবেষণার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য অনন্ত জলিলের তিনটি চলচ্চিত্রের আধেয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যার মাধ্যমে অনন্ত জলিলের চলচ্চিত্রের পাশাপাশি বর্তমান চলচ্চিত্রে নায়ক নির্মাণের চিত্র ফুটে উঠেছে। গবেষণায় দেখা যায়, বর্তমানে নায়ক চরিত্রটিকে সুপুরুষ, শক্তিমান, বুদ্ধিমান, দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ও সর্বকাজে সক্ষম হিসেবে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। নায়ক চরিত্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতেই অন্যান্য সকল চরিত্র নায়কের জন্য কাজ করে। আলোচ্য চলচ্চিত্রগুলোতে নায়ক চরিত্র ফুটিয়ে তুলতেই অন্যান্য চরিত্রের পাশাপাশি নায়িকাকেও ব্যবহার করা হয়েছে। নায়িকাকে নানা বিপদের মাঝে ফেলে দিয়ে নায়কের মাধ্যমে তাকে উদ্ধার করে নায়কের উদ্ধারকর্তার চরিত্রটি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। নায়িকাকে দেখানো হয়েছে নায়কের অধস্তন হিসেবে।

১.০ ভূমিকা

গণমাধ্যমের যুগে চলচ্চিত্র একটি শক্তিশালী মাধ্যম। চলচ্চিত্রশিল্পের বয়স যত, নায়ক-নির্ভর চলচ্চিত্রের বয়স তত নয়; বরং সোভিয়েত রাশিয়ায় কোনো বিশেষ চরিত্রকে কেন্দ্র না করে চলচ্চিত্র নির্মাণের স্বাক্ষর আমরা পাই সের্গেই আইজেনস্টাইনের *ব্যাটেলশিপ পটেমকিন (১৯২৫)* কিংবা *অক্টোবর (১৯২৭)* চলচ্চিত্রে। কিন্তু এরপর ধীরে ধীরে চলচ্চিত্রে মূল চরিত্রের প্রসার ঘটতে থাকে। বিশ শতকের বিশ ও তিরিশের দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চলচ্চিত্রে তুমুল জনপ্রিয়তা পান চার্লস চ্যাপলিন। তিনি কমেডি নির্ভর অনেকগুলো চলচ্চিত্র নির্মাণ ও অভিনয় করেন। মুক্তি পায় *গোল্ড রাশ* (১৯২৫), *সার্কাস* (১৯২৮), *সিটি লাইট* (১৯৩১) ইত্যাদি বিখ্যাত চলচ্চিত্র।

এই ছবিগুলোতে একটি ভবঘুরে চরিত্রকে কেন্দ্র করে চলচ্চিত্র নির্মাণ বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। চরিত্রগুলোর সফলতার মাধ্যমে চলচ্চিত্রে নায়কের চরিত্র জনপ্রিয় হতে থাকে। এসব চলচ্চিত্রের বেশ পরে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের যাত্রা শুরু হয়। সময়ের পরিক্রমায় বাংলাদেশের চলচ্চিত্র বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যে রূপায়িত হয়েছে :

> ১৯৫৬ সালে আবদুল জব্বার খানের মুখ ও মুখোশ চলচ্চিত্রের মাধ্যমে শুরু হয় বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের পথ যাত্রা। বিভিন্ন দশকে চলচ্চিত্র নানা বৈশিষ্ট্যে রূপায়িত হয়েছে। কখনো বাংলা চলচ্চিত্র ছিলো

* প্রভাষক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

** সাবেক শিক্ষার্থী, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

> সামাজিক বক্তব্যধর্মী। কখনো আবর্তিত হয়েছে রোমান্স নিয়ে। আবার কখনো তা হয়ে উঠেছে সহিংসতা-নির্ভর। পুরুষ প্রধান এই চলচ্চিত্রগুলোতে নায়ক শক্তিমান, সবল হিসেবে চিত্রিত হয়েছে। পুরুষকে দেখানো হয় স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে। বাংলাদেশের মূলধারার চলচ্চিত্র নায়ক-নির্ভর এবং নায়কই মূল সংগঠক হয়ে থাকে। (নাসরীন ১৪১০: ১১৭)

সূচনালগ্ন থেকেই বাংলা চলচ্চিত্র পুরুষনির্ভর ও পুরুষকেন্দ্রিক ছিলো। বিগত পাঁচ দশকের চলচ্চিত্রে নায়ক চরিত্রের চিত্রায়ণে নানা পরিবর্তন এসেছে। নায়ককে সুপার হিরো হিসেবে দর্শকের সামনে উপস্থাপনের প্রবণতা পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে বলে বিভিন্ন গবেষণায় উঠে এসেছে।

আমাদের এই চলচ্চিত্র-শিল্প যখন প্রায় মরতে বসেছে তখন কিছুটা আশার আলো দেখালেন নবাগত নায়ক এম এ অনন্ত জলিল। প্রায় বছর আটেক আগে তিনি চলচ্চিত্রে যাত্রা শুরু করেন। তার প্রথম চলচ্চিত্র *খোঁজ দ্যা সার্চ* (২০১০)। তিনি নিজেই তার সিনেমার প্রযোজক। কাহিনির আন্তর্জাতিক চেহারা, বিগ বাজেট, স্পেশাল ইফেক্টের ব্যবহার, মনোরম লোকেশন বাছাই ইত্যাদি কারণে তার চলচ্চিত্রগুলো দর্শকের দৃষ্টি আর্কষণ করে। আবার আন্তর্জাতিক চেহারা দেওয়ার জন্য ইংরেজির প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ, কাহিনির উদ্ভটতা বা নায়ক চরিত্রে তার নিজের জড়তাগ্রস্ত অভিনয়রীতি অথবা নিজের কাজ নিয়ে মিডিয়ায় তার বেপরোয়া আত্মবিশ্বাসের প্রকাশ ইত্যাদি বিষয় কিছু মিশ্র আলোচনার জন্ম দেয় দর্শকদের মধ্যে।

চলচ্চিত্রে আমরা নারী-পুরুষের উপস্থাপন দেখি। পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার কারণে প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের রূপায়ণ এবং অংশগ্রহণের কিছু ভিন্নতা থাকে। চলচ্চিত্রও এর বাইরে নয়। চলচ্চিত্রে তাই নায়ক নির্মাণ আমাদের প্রচলিত সমাজব্যবস্থার প্রতিফলন হবে এমনটা ধরে নেয়া যায়। বেশিরভাগ চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন পুরুষ এবং তাদের নির্মাণের সময় তাদের মাথায় থাকে পুরুষতান্ত্রিকতা। তাই আমরা অনন্ত জলিল অভিনীত চলচ্চিত্রগুলোতেও দেখতে পাই পুরোমাত্রার নায়ক-নির্ভরতা। যেখানে নায়ককে সর্বময় করে তুলে ধরা হয়েছে। এম এ জলিল অভিনীত চলচ্চিত্রে কিভাবে পুরুষতন্ত্র ফুটে উঠেছে বা নায়ককে কিভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে তাই দেখানো হয়েছে এই গবেষণা-প্রবন্ধে।

২.০ গবেষণার যৌক্তিকতা

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে নারীর রূপায়ণ নিয়ে পূর্বে অনেক কাজ হয়ে থাকলেও নায়কের রূপায়ণ নিয়ে কাজ হয়নি বললেই চলে। এমনকি বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটেও নায়ক-নির্মাণ নিয়ে কাজ হয়েছে নারী-নির্মাণের তুলনায় অনেক কম। শুধু নারীর রূপায়ণের বিশ্লেষণ করলেই জেন্ডার-নির্মাণের পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায় না। জেন্ডার নির্মাণের পূর্ণাঙ্গ চিত্র পেতে চলচ্চিত্রে নায়ক-নির্মাণের স্বরূপ বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন রয়েছে। তাই এই গবেষণাকর্মটি বর্তমান সময়ে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে জেন্ডার-নির্মাণের পূর্ণাঙ্গ চিত্র ফুটিয়ে তুলতে সহায়ক হবে।

৩.০ গবেষণার উদ্দেশ্য, প্রশ্ন ও নমুনায়ন

এম এ অনন্ত জলিল প্রযোজিত চলচ্চিত্রে নায়ক নির্মাণের ধরন নির্ণয়, চলচ্চিত্রে নায়ক নির্মাণ সমাজে বিদ্যমান জেন্ডার-ধারণার ছাঁচকে আরও বদ্ধমূল করে কিনা তা পর্যবেক্ষণ এবং চলচ্চিত্রে নায়কের এই উপস্থাপন কোনো ছদ্ম-বাস্তবতা তৈরি করে কিনা, তা পর্যবেক্ষণ করার উদ্দেশ্যে গবেষণাকর্মটি পরিচালিত হয়েছে। গবেষণাকর্মের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য সরল নির্বিচার নমুনায়ন পদ্ধতিতে অনন্ত জলিলের *খোঁজ দ্যা সার্চ*, *দ্যা স্পীড* ও *হৃদয় ভাঙ্গা ঢেউ* এই তিনটি চলচ্চিত্র বেছে নেওয়া হয়েছে। উক্ত তিনটি চলচ্চিত্র বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই তিনটি চলচ্চিত্রের পাশাপাশি অনন্ত জলিলের অন্যান্য চলচ্চিত্রে নায়ক-নির্মাণের পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া সম্ভব হবে। গবেষণার উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে গিয়ে সুনির্দিষ্ট কিছু প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রশ্নগুলো হলো :

চলচ্চিত্র তিনটিতে নায়ককে কিভাবে চিত্রায়ণ বা নির্মাণ করা হয়েছে?

চলচ্চিত্র তিনটিতে নায়িকা নির্মাণের বিপরীতে নায়ক নির্মাণের ধরন কেমন?

৪.০ তাত্ত্বিক কাঠামো

এই গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামো গড়ে উঠবে রেপ্রিজেন্টেশন তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে। সাধারণ অর্থে রেপ্রিজেন্টেশন বা পরিবেশনা হলো, ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের কাছে দুনিয়াকে অর্থপূর্ণভাবে বলা বা উপস্থাপন করা। রেপ্রিজেন্টেশন তত্ত্ব অনুযায়ী, বাস্তব বলে কিছু নেই বরং বাস্তবের নির্মিতি আছে, নির্মাণ-প্রক্রিয়া আছে। যতই বাস্তব বলে মনে হোক না কেন, সব টেক্সটই আসলে 'নির্মিত' বাস্তবের প্রতিনিধিত্ব করে। (হল, ১৯৯৭ [২০১৩]: ১৭)

> রেপ্রিজেন্টেশন হলো এমন একটি প্রক্রিয়ার অপরিহার্য অংশ যার মাধ্যমে একটা সংস্কৃতির সদস্যদের মধ্যে অর্থ উৎপাদন ও বিনিময় হয়ে থাকে। এর মাধ্যমে ভাষা, চিহ্ন ও ইমেজের ব্যবহারসূত্রে বিভিন্ন বিষয়ের অর্থ নির্দেশ বা উপস্থাপন করা হয়। (হল, ১৯৯৭ [২০০৭]: ৯)

স্টুয়ার্ট হল তাঁর *রেপ্রিজেন্টেশন* প্রবন্ধে রেপ্রিজেন্টেশনের তিনটি অ্যাপ্রোচের কথা বলেছেন।

প্রতিফলনকারী বা অনুকৃতি অ্যাপ্রোচ (Reflective Approach)

স্বেচ্ছাকৃত অ্যাপ্রোচ (Intentional Approach) এবং

নির্মাণমূলক অ্যাপ্রোচ (Constructionist Approach)

বর্তমান গবেষণাটিতে উপরের এই তিনটি অ্যাপ্রোচের মধ্যে স্বেচ্ছাকৃত ও নির্মাণমূলক অ্যাপ্রোচের প্রয়োগ করা হবে। স্বেচ্ছাকৃত অ্যাপ্রোচে রেপ্রিজেন্টেশনকে ব্যক্তির ইচ্ছাধীন বলে ভাবা হয়। এটা বলে যে, বক্তা বা লেখক তার ভাষার মাধ্যমে বিশ্বের সবকিছুর ওপর তার অর্থ আরোপ করেন। এই অ্যাপ্রোচ অনুসারে, চলচ্চিত্র-নির্মাতারা চলচ্চিত্রে পুরুষকে যেমন করে তৈরি করেন, সেভাবেই বাস্তবতা নির্মিত হয়। বাস্তবে পুরুষ যেমন, নির্মাণের ক্ষেত্রে সেটি মুখ্য নয়, নির্মাতার উদ্দেশ্যই মুখ্য।

নির্মাণমূলক অ্যাপ্রোচ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে হল তার প্রবন্ধে বলেন,

> নির্মাণমূলক অ্যাপ্রোচ জগতের বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে জটিল ও মধ্যস্থতাকারী সম্পর্কের কথা বলে, চিন্তা ও ভাষায় আমাদের ধারণার কথা বলে। এটি বলে যে, বস্তু নিজে বা ভাষা ব্যবহারকারী, কেউই ভাষার অর্থ স্থির করতে পারে না। বস্তু অর্থ দেয় না, আমরা রেপ্রিজেন্টেশন সিস্টেমে ধারণা ও চিহ্নের মাধ্যমে অর্থ নির্মাণ করি। (হল, ১৯৯৭ [২০০৭]: ১৭)

এ গবেষণায় নির্মাণমূলক অ্যাপ্রোচ অর্থে রেপ্রিজেন্টেশন প্রত্যয়টি ব্যবহৃত হবে এবং অনন্ত জলিল অভিনীত চলচ্চিত্রে নায়কনির্মাণ রেপ্রিজেন্টেশনের নির্মাণমূলক ধারণা থেকে বিশ্লেষিত হবে।

৫.০ গবেষণার পদ্ধতি ও উপাত্ত সংগ্রহ

এটি একটি গুণাত্মক গবেষণা। এ ধরনের গবেষণার প্রাথমিক লক্ষ্য হিসাবে প্রতিনিধিত্বশীল তথ্য খুঁজে বের করার চেয়ে একটি সামাজিক প্রক্রিয়াকে অনুধাবনের প্রচেষ্টাই বেশি থাকে। (Henn, 2006: 157) এ গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের জন্য আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে। সমাজ গবেষণায় আধেয় বিশ্লেষণ একটি কার্যকর উপাত্ত সংগ্রহ কৌশল বা পদ্ধতি। বিভিন্ন সামাজিক রচনা বা শিল্প, যেমন বই, সঙ্গীত, ভাষ্য, চিত্রকলা, আলোকচিত্র, চলচ্চিত্র ইত্যাদি সতর্কভাবে নির্দিষ্ট উপায়ে অধ্যয়ন করে সামাজিক তথ্যাবলি সংগ্রহের পদ্ধতিকে আধেয় বিশ্লেষণ বলে। এ গবেষণায় অনন্ত জলিল অভিনীত ও প্রযোজিত তিনটি চলচ্চিত্রের আধেয় বিশ্লেষিত হয়েছে। ফিল্ম ন্যারেটোলজির সাহায্যে এ আধেয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ও আর হোলস্টি (১৯৬৯) বলেছেন, 'আধেয় বিশ্লেষণ হচ্ছে এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক কৌশলে প্রমাণ সংরক্ষণ করা যায়।' (রহমান ২০০০: ৯২)

জেরার্ড জেনেট তার 'Narrative Discourse: An Essay in Method' (1980) বইতে সাহিত্যের ক্ষেত্রে ন্যারেটিভ

বা আখ্যান বিশ্লেষণের একটি মডেল প্রণয়ন করেন। পরবর্তী সময়ে চলচ্চিত্র গবেষকরা চলচ্চিত্র বিশ্লেষণে এই পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন যা 'ফিল্ম ন্যারেটোলজি' নামে পরিচিতি লাভ করে। তিনটি সুনির্দিষ্ট ধারণা তিনি ব্যক্ত করেন তার প্রবর্তিত মডেলে :

বক্তব্য (Recit): এটি হচ্ছে চিহ্নায়ক, এক্ষেত্রে কোনো বক্তব্য। অন্য অর্থে আলোচ্য বয়ান বা বর্ণিত পাঠ। দর্শকের কাছে গল্পের মাধ্যমে পৌঁছানোর যে বাচিক বা চলচ্চিত্রীয় ডিসকোর্স, তা-ই Recit। সহজ অর্থে ফিল্ম ন্যারোটলজিতে Recit-এর মাধ্যমে চলচ্চিত্রটির বক্তব্য বা বার্তা উদঘাটন করা হয়।

কাহিনি (Histoire): এটি হচ্ছে Recit-এর অন্তর্গত অর্থ বা চিহ্নায়িত, অর্থাৎ গল্প জগৎটি। এটি চলচ্চিত্রের কাহিনিকে নির্দেশ করে।

বর্ণনকৌশল (Narration): কাহিনির মাধ্যমে চলচ্চিত্রের বক্তব্য যে চলচ্চিত্রিক কৌশল বা ভাষায় বর্ণিত হয়, তা-ই বর্ণনকৌশল।

অনন্ত জলিলের উল্লেখিত তিনটি চলচ্চিত্রের আধেয় বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই প্রবন্ধে তার চলচ্চিত্রে নায়ককে কিভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে সেটি নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে।

৬.০ সাহিত্য পর্যালোচনা

গণমানুষের উপর গণমাধ্যমের যে শক্তিশালী প্রভাব রয়েছে তা গণমাধ্যম বিষয়ক নানা গবেষণায় উঠে এসেছে। গণমাধ্যম যেভাবে সমাজকে গণমানুষের সামনে উপস্থাপন করে, সমাজের মানুষ সমাজকে সেই ভাবেই চিন্তা করে। আবার, সমাজের বাস্তব অবস্থানও গণমাধ্যমকে প্রভাবিত করে। তাই গবেষক নাসরীন তার প্রবন্ধে উল্লেখ করেন, 'গণমাধ্যম এবং সমাজ দুটোই দুটোকে প্রভাবিত করে। গণমাধ্যম যেমন সমাজের প্রতিফলন, তেমনি গণমাধ্যমে যা দেখানো হয় তা সমাজে প্রতিফলিত হয়।' (২০০৪:১১৭)

যেহেতু গণমাধ্যম ও সমাজ একে অপরকে প্রভাবিত করে তাই গণমাধ্যমে যা দেখানো হয় সেটা সমাজেরই বাস্তবতা। আবার, গণমাধ্যমের এই উপস্থাপন সমাজের বিদ্যমান বাস্তবতাকে আরো বেশি শক্তিশালী করে। এই বিষয়ে গবেষক হক তার প্রবন্ধে বলেন,

> আমাদের সমাজ পিতৃতান্ত্রিক। সুতরাং চলচ্চিত্র নারী-পুরুষের যে চিত্রায়ণ করে তাতে বিদ্যমান সমাজ কাঠামোরই প্রতিফলন ঘটে। বিদ্যমান সমাজব্যবস্থা পুরুষতান্ত্রিক, পুরুষতান্ত্রিক মতাদর্শই সমাজে প্রাধান্যশীল; সর্বার্থে সমাজের ক্ষমতার কেন্দ্রগুলো পুরুষেরই দখলে। (২০০৬:৭)

তাই চলচ্চিত্রে পুরুষকে যেভাবে নির্মাণ করা হয় তা নারী-পুরুষের সামাজিক বৈষম্যকে অটুট রাখে, পুরুষকে শ্রেষ্ঠতর হিসেবে নির্মাণ করে এবং পুরুষের উন্নত ও নারীর অধস্তন অবস্থাকে স্বাভাবিক হিসেবে আমাদের সামনে হাজির করে।

নারীর এই অধস্তন অবস্থান সকল ধরনের চলচ্চিত্রেই লক্ষ করা যায়। গবেষক গায়েন তার 'মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্রে নারী-নির্মাণ' শীর্ষক গবেষণায় দেখান, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রায় সবগুলো চলচ্চিত্রেই 'নারীকে যোদ্ধা চরিত্রে দেখা যায়নি' বরং সেখানে প্রচলিত চলচ্চিত্রের মতই নিজেকে ধর্ষণের হাত থেকে রক্ষা করা বা খল নায়কদের আনন্দের বস্তুরূপে নারীকে উপস্থাপন করা হয়েছে। (গায়েন, ২০১৩:১৫৩)

বাংলাদেশে পুরুষ-নির্মাণ নিয়ে একমাত্র কাজ হয়েছে চলচ্চিত্র বিষয়ে। বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে পুরুষ-নির্মাণ নিয়ে গবেষণা করেন গণমাধ্যম গবেষক গীতি আরা নাসরীন। 'ভাবপ্রবণ থেকে উন্মাদ: রূপালী পর্দায় নায়কের বিবর্তন' শীর্ষক গবেষণায় নাসরীন (২০০৪) দেখান যে,

> বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে ৬০ এর দশকের নায়কদের তুলনায় ৯০ দশকের নায়কেরা অনেক বেশি

> পুরুষালি রূপে আবির্ভূত। ষাটের দশকের নায়করা ছিলেন সৎ, সরল, সংগ্রামী, সাহসী এবং শালীন। কিন্তু বর্তমানের নায়কেরা হিংস্র, বেপরোয়া, উন্মত্ত। (নাসরীন, ২০০৪:১১৯)

তিনি পূর্বের সময়ের নায়ক হিসেবে রাজ্জাক এবং বর্তমানের প্রতিনিধি হিসেবে মান্নার আলোচনা এনে দেখান যে, বর্তমানের পুরুষ নির্মাণে শারীরিক এবং চারিত্রিক দুই দিক থেকেই পার্থক্য রয়েছে। পূর্বের নায়কের তুলনায় বর্তমানের নায়ক অনেক বেশি সমাজ নির্মিত পুরুষালি বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। 'নায়ক রাজ্জাক ছোটখাট, লাজুক। মান্না উদ্ধত, বেপরোয়া। রাজ্জাক ধীর স্থির ও শান্ত এবং মান্না অস্থির, অর্ধোন্মাদ।' (নাসরীন, ২০০৪:১১৯)

তিনি নব্বইয়ের তিনটি চলচ্চিত্রের আধেয় বিশ্লেষণ করে দেখান যে, এসব চলচ্চিত্রে সহিংসতাকে পুরুষের ধর্ম বা দ্বিতীয় প্রকৃতি হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। যুক্তিহীন পশুশক্তির প্রকাশ ঘটানোকে নব্বই-পরবর্তী চলচ্চিত্রে তাদের ক্ষমতার পরিচয় হিসেবে দেখানো হয়। 'নায়কেরা এখন মানবিক কোমলতা, নৈতিকতা বিবর্জিত। অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় তারা হিংস্র কার্যকলাপে লিপ্ত হয়।' (নাসরীন, ২০০৪:১২৪)

তিনি তার গবেষণায় দেখান, এই হিংস্রতাই এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়, তাতে শক্তিমান নায়কের প্রতি সহানুভূতি জাগে। বরং এই সময়ের সহনায়ক যাদের দেখা যায়, তারা বাধ্য না হলে সহিংসতায় লিপ্ত হন না বলেই পর্দায় এরা দুর্বলরূপে উপস্থিত।

> তিনি যেন ঠিক পুরুষ নন। একটু পুরুষ, একটু মেয়েলী, তাই তাকে কাপুরুষই বলা চলে। অত্যন্ত সুকৌশলে প্রায় কিশোর চেহারার এই দুর্বল নায়কদের বাছা হয়। এই ধরনের নির্মাণ থেকে এই ধারণা হয় যে, সৃজনশীলতা, মানবতা, ভালোবাসা বা ত্যাগের মত গুণগুলো আসলে মেয়েলি। সত্যিকারের পুরুষের এসব থাকে না। (নাসরীন, ২০০৪:১২৫)

নাসরীন ও হক তাদের বইতে দেখান, মূলধারার চলচ্চিত্র নায়ককে একজন সুপার হিরো হিসেবে উপস্থাপনের প্রয়াস পায়। সেখানে সমাজের সাধারণ মনুষের প্রতিনিধিত্ব তো থাকেই না। বরং চলচ্চিত্রগুলো দর্শকের মাঝে সুপার হিরো হওয়ার ক্যাথারসিস বাসনা তৈরি করে।

বাংলা চলচ্চিত্রে নায়কের নৈতিক স্খলনকে খারাপ আর্থে না দেখে বরং সেগুলোকে নানা উপায়ে বৈধ করা হয়। নায়কের এরূপ চিত্রায়ণ নিয়ে চলচ্চিত্র-গবেষক রুবাইয়াৎ আহমেদ বলেন,

> চলচ্চিত্রে আমরা দেখতে পাই মাস্তানতন্ত্রের প্রতীকরূপে নায়ক যতই মদ্যপান করে মাতাল হোক, যতই মারামারি করুক, যতই বাঈজীপাড়ায় যাতায়াত করুক, দর্শকের কাছে তা স্খলনের কোনো বার্তা বহন করে না। বরং তার পেশী শক্তি তাকে প্রতিষ্ঠিত করে নায়কের আসনে। (আহমেদ, ২০১১:৮০)

গীতি আরা ও ফাহমিদুল ঢাকার ছবির শ্রেণিচেতনা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখিয়েছেন কী করে এ দেশের ছবিগুলো ধনী-দরিদ্র, ন্যায়-অন্যায় দ্বন্দ্বের অবাস্তব, একরৈখিক সব সমাধান দিয়ে থাকে। যেমন ধনীর সম্পদ লুট করে গরিবের মাঝে বিলিয়ে দেয়া, নানা অসম্ভব প্রক্রিয়ায় নায়কের একক প্রচেষ্টায় সমাজে সন্ত্রাস নির্মূল করা।

গবেষক গীতি আরা নাসরীন ও হক দেখতে পান নব্বইয়ের মূলধারার চলচ্চিত্রে নায়ক চরিত্রগুলো মূলত উন্মত্ত, হিংস্র, নৃশংস হিসেবে চিত্রিত হয়েছে। ছবির প্রধান চরিত্র শুধু পুরুষই নয়, হিংস্র পুরুষ। আপাত ভালোমানুষ সৎ নায়ক শুধুমাত্র প্রতিশোধ নেবার জন্যই নানা ধরনের নৃশংস কার্যকলাপে লিপ্ত হয়। এই যে নায়কের বেআইনি, বীভৎস কাজ, তার উৎস কিন্তু আবার অনেক সময় নারীর সতীত্ব রক্ষা। (২০০৮: ৫৩)

গীতি আরা নাসরীন ও ফাহমিদুল হক তাদের *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্প: সংকটে জনসংস্কৃতি* (২০০৮) গ্রন্থে এফডিসিনির্ভর ঢাকাই চলচ্চিত্রে পুরুষ চরিত্র ও নারী চরিত্রের রূপায়ণ বিশ্লেষণ করছেন। তারা নারী-পুরুষ চরিত্রকে সংক্ষেপে 'প্রবল পুরুষ' ও 'নর্তকী নারী' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তারা নির্বাচিত চলচ্চিত্রের আধেয় বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন প্রধান পুরুষ চরিত্রগুলো কিরকম সহিংস ও প্রতাপশালী। পুরো চলচ্চিত্রজুড়ে তাদের দাপটে নারী

চরিত্রগুলো গৌণ ও অবিকশিত থাকে। তাদের যেন পুরুষের মনোরঞ্জনের জন্য নৃত্য-গীত পরিবেশনা ছাড়া আর কোনো কাজ নেই।

'ঢাকাই চলচ্চিত্রে নর-নারীর সম্পর্ক প্রকৃতি ও প্রবণতা বিশ্লেষণ' (২০১১) শীর্ষক অপ্রকাশিত অভিসন্দর্ভে গবেষক তানিয়া সুলতানা চলচ্চিত্রে নর-নারী সম্পর্ক ও নানা বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোকপাত করেছেন। নর-নারী প্রত্যয় উল্লেখ করা হলেও গবেষণায় মূলত চলচ্চিত্রের নায়ক-নায়িকার সম্পর্ক নিয়েই মূল আলোচনা এগিয়ে গেছে।

গবেষণায় তিনি দেখতে পান, সিনেমায় নায়িকাকে খল চরিত্রের হাত থেকে উদ্ধার কিংবা প্রেমের সম্পর্ক নির্মাণের ক্ষেত্রে নায়কই সক্রিয় থাকে। তার সম্মতি-অসম্মতির উপরই প্রেমের সফলতা নির্ভর করে। অর্থাৎ নায়কই হয়ে ওঠে মূল সংগঠক।

ক্রিস্টোফার ফ্লুক (২০০৭) তার *অ্যা ক্রিটিক্যাল অ্যানালাইসিস অব ম্যাসকু লিনিটিপোট্রেয়ালস ইন ফিল্ম: ডেফিনিশন, আইডিয়া এন্ড পসিবল সল্যুশন* শীর্ষক গবেষণায় দেখান,

> হলিউড ফিল্ম ইন্ড্রাস্ট্রিতে ম্যাসকিউলিনিটি অন্যতম অনুষঙ্গ হয়ে আছে। আগে যেখানে কাউবয় চরিত্র মার্কিন চলচ্চিত্রের আইকন হিসেবে দেখা হতো, এখন সেখানে পরিবর্তন এসেছে। আশির দশকে আইকনে পরিণত হয় এ্যাকশন হিরো। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের সমাজের আইকনে পরিণত হয়েছে বিল গেটস, রুপার মার্ডকের মতো বিলিয়নিয়ররা। তাই চলচ্চিত্রের আইকনও হয়ে উঠছে তারা। নির্মিত হচ্ছে ওয়াল স্ট্রিট (১৯৮৭), ম্যানহাটন এন্ড হলিউডের মতো চলচ্চিত্র, যেখানে মূল চরিত্রকে দেখা যায় কোটিপতি হিসেবে। (ফ্লুক, ২০০৭: ১৬)

ফ্লুকের এই বিশ্লেষণ বর্তমান গবেষণার সাথে প্রাসঙ্গিক। ফ্লুক তার গবেষণায় যেমন দশক ভেদে হলিউডের চলচ্চিত্রে নায়কের রূপায়ণের গুণগত পার্থক্য দেখছেন, এই গবেষণাতেও তেমনটাই দশক ভেদে বাংলা চলচ্চিত্রে নায়কের চিত্রায়ণের পার্থক্য বিশ্লেষিত হয়েছে।

এই গবেষণায় অনন্ত জলিলের তিনটি চলচ্চিত্রের ব্যবচ্ছেদের মাধ্যমে নায়ক নির্মাণ কী হচ্ছে বা কিভাবে হচ্ছে তা অনুধাবনের চেষ্টা করা হয়েছে।

৭.০ অনন্ত জলিল অভিনীত তিনটি চলচ্চিত্রে নায়ক-নির্মাণ

৭.১ *খোঁজ দ্যা সার্চ*

খোঁজ দ্যা সার্চ চলচ্চিত্রটি ২০১০ সালে মুক্তি পায়। ইফতেখার চৌধুরী পরিচালিত অনন্ত জলিল অভিনীত প্রথম চলচ্চিত্র এটি। মনসুন ফিল্ম পরিবেশিত এ ছবির প্রযোজনা করেছেন অনন্ত জলিল।

কাহিনি (Histoire)

Bangladesh, Secret Service এর প্রধান সোহেল রানা। মাফিয়া ডন নিনো নবাবকে মারতে লোক পাঠালে মেজর মাহমুদ তাদের মেরে ফেলে। তাদের কাছে জানতে চায় নিনো কোথায়? কারণ নিনোকে ধরাই তার অ্যাসাইনমেন্ট ছিল। সারা তাকে জানায় যে নিনো সুইজারল্যান্ডে রয়েছে।

নায়িকা বর্ষা (এলিসা) গ্রামের বাড়িতে আসার মাধ্যমে তাঁর চলচ্চিত্রে আগমন ঘটে। মাহমুদ বিদেশ থেকে ফিরলে মা বিয়ে করার কথা বললে সে বিয়ে করতে রাজি হয় না। অফিসে আসলে সোহেল রানা তাকে পুরো কাজটা বুঝিয়ে দিয়ে বলে, নিনো এই উপমহাদেশে অস্ত্র ব্যবসা বাড়িয়ে দিয়েছে। সোহেল রানা তাকে সাবধান করে যে, তাকে আটক করা খুবই বিপজ্জনক। সেখানে মাহমুদের জীবনের ঝুঁকি রয়েছে। মাহমুদ বলে আমি দেশকে ভালবাসি। দেশের জন্য জীবন দিতে আমি প্রস্তুত।

মাহমুদ নিনো সম্পর্কে জানতে চাইলে সোহেল রানা তাকে বলে, সিক্রেট সার্ভিস এনালিস্ট ববি তাকে সব বিষয় জানাবে। মাহমুদ হচ্ছে Secret Service-এর গৌরব। কারণ সে সব মিশনে সফল হয়েছে। ববি বলে নিনোকে

মায়ানমারে পাওয়া যাবে।

মাহমুদ একাই মায়ানমারের যায় নিনোকে খোঁজার জন্য। সে একাই আসে নিনোকে ধরার জন্য। নায়ক একাই সবাইকে ধরাশায়ী করে দেয়। নিনো মাহমুদকে পেছন থেকে আঘাত করে। তাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয় নিনোর আস্তানায়। নিনোর দলের সদস্য ডা. এজাজ (মাস্টার) তাকে অনেক মারধর করে। BSS মনে করেছিল মাহমুদ মারা গেছে।

ডা. এজাজ তাদের দলে আসার জন্য বলে। তাকে তাদের দলে এসে নাম পরিবর্তন করে অনন্ত হতে বলে। মাহমুদ তার কথায় রাজি হয়ে যায়। ডা. এজাজ তাকে প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট দেয় বাংলাদেশের ক্ষমতাশালী রুস্তমকে খুন করা। তারপর রুস্তমের মেয়েকে খুন করতে বলে। অনন্ত মেয়েকে মারতে রাজি হয় না। সে তাদের খুন না করে চলে আসে। মিশনে ব্যর্থ হওয়ায় ডা. এজাজ অনন্তকে মারার জন্য লোক পাঠায়। অনন্ত ব্রিজ থেকে নদীতে পড়ে যায় এবং তার স্মৃতি হারিয়ে ফেলে।

এলিসা প্রেম করে পাভেলের সাথে। আর পাভেল হল প্রতারক। এলিসা ও পাভেল খেতে আসে। সেখানে এসে উপস্থিত হয় এলিসার বড় ভাই নবাবের লোকজন। সেখান থেকে এলিসাকে বাসায় আনা হয়। নবাব তাকে বলে বাইরে বের না হতে। এ দিকে মাহমুদ সোহেল খানের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে। একটি গাড়িতে ওঠে সে; একই গাড়িতে ওঠে এলিসা। এলিসাকে ধরে নিয়ে যেতে আসে তার ভাই নবাবের লোকজন। তখন অনন্ত তাদের সবাইকে মেরে ফেলে। নায়িকাকে মোটর সাইকেলে নিয়ে পালিয়ে যায়। মাহমুদ ও এলিসা আবারও সোহেল খানের বাড়ি আসে। এলিসা মাহমুদকে তার সম্পর্কে আবারও জিজ্ঞেস করে। মাহমুদ শুধু তার নাম অনন্ত ছাড়া আর কিছু জানে না।

মাহমুদ ডা. এজাজকে খুন করতে আসে। ডা. এজাজের দিকে বন্দুক তাক করে মাহমুদ তার জীবন সম্পর্কে জানতে চায়। ডা. এজাজ তাকে সব বলে দেয়। মাহমুদের সাথে হাত মেলাতে চায় সে। কিন্তু মাহমুদ হাত মেলাতে রাজি হয় না। শেষে মাহমুদ ডা. এজাজকে খুন করে।

নিনোর লোকজন মাহমুদের বাড়িতে এসে মাহমুদকে আক্রমণ করার চেষ্টা করে এবং না পেরে মাহমুদের মাকে খুন করে। মাহমুদ তার মায়ের দাফন সম্পন্ন করে আবার বিএসএস অফিসে সোহেল রানার সাথে দেখা করে। ববি তাকে তথ্য দেয় নিনো কোথায় লুকিয়ে রয়েছে। মাহমুদ নিনোকে ধরার জন্য একাই যায়। নিনোর দলের একটি মেয়ে এলিসাকে গুলি করে। মাহমুদ তার দিকে মনোযোগ না দিয়ে পরের আক্রমণে চলে যায়। এদিকে সোহেল রানা বুঝতে পারে মেজর কামরুল নিনোকে সাহায্য করছিল। নিনোকে মাহমুদ ট্রেনের মধ্যে আক্রমণ করে। মাহমুদ নিনোকে খুন করে।

৭.১.২ বক্তব্য (Recit)

এই সিনেমায় নানা বক্তব্যের মাধ্যমে নায়ককে আক্রমণাত্মক, দেশপ্রেমিক, অতিমানবী, দয়ালু, প্রতিবাদী হিসেবে দেখানো হয়েছে। বোঝানো হয়েছে, তার সকল অপরাধ দেশের স্বার্থে, তাই ক্ষমার যোগ্য।

নায়ক আক্রমণাত্মক

সিনেমায় নায়কের নাম মেজর মাহমুদ। সে Bangladesh Secret Service-এ চাকরি করে। সিনেমার প্রথমেই আমরা দেখি BSS-এর প্রধান সোহেল রানা তাকে মিশনে পাঠায় মাফিয়া ডন নিনোকে খুন করার জন্য। নায়ক নিজের জীবনের ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও নিনোকে মারার জন্য পিছপা হয় না। পুরো চলচ্চিত্রে নায়ককে এভাবেই দেখানো হয় – মাফিয়া ডন নিনোকে ধ্বংস করার জন্য আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে।

নায়ক দেশপ্রেমিক

মাহমুদ নিনোকে ধরার জন্য যখন নিউইয়র্ক যায় তখন সোহেল রানা তাকে বলে নিনোকে ধরা খুবই বিপজ্জনক। সেখানে মাহমুদের জীবনের ঝুঁকি রয়েছে। মাহমুদ বলে আমি দেশকে ভালবাসি। দেশের জন্য জীবন দিতে আমি

প্রস্তুত। এখানে নায়ককে নির্মাণ করা হয়েছে দেশপ্রেমিক হিসেবে।

নায়কের জীবনে প্রেম খুব তুচ্ছ

ববি মাহমুদের সাথে অফিসের বিষয় বাদে ব্যক্তিগত বিষয়ে কথা বলতে চাইলে মাহমুদ তাতে আগ্রহ দেখায় না। ববি মাহমুদের প্রেমে পড়ে যায়। ববি মাহমুদকে নিয়ে বিভিন্ন কল্পনা করে। কিন্তু নায়ক মাহমুদের সে ব্যাপারে কোনো আগ্রহ দেখা যায় না।

নায়ক অতিমানব ও একাই একশ

মাহমুদ মায়ানমারের ব্ল্যাক ফরেস্টে যায় নিনোকে খোঁজার জন্য। সে একাই আসে নিনোকে ধরার জন্য। সে একাই সবাইকে ধরাশায়ী করে দেয়। এলিসা (নায়িকা) যখন বাড়ি থেকে পালিয়ে যায় তখন তার ভাইয়ের লোকেরা যখন তাকে বাড়ি নিয়ে যেতে চায় তখন মাহমুদ সবাইকে মেরে এলিসাকে নিয়ে যায়। আমরা পুরো চলচ্চিত্রে দেখি যে, নায়ক সকল মিশনে একা একা যায়। তার কোন সহযোগীর দরকার হয় না।

নায়ক দয়ালু

এই চলচ্চিত্রে নায়ককে বাংলাদেশের এক ক্ষমতাশালী রুস্তম ও তার ছোট মেয়েকে খুন করার জন্য বলা হয়। কিন্তু রুস্তমের ছোট মেয়েকে দেখে নায়কের দয়ালু মনোভাব জেগে ওঠে। সে তাদের খুন না করে চলে আসে।

নায়ক প্রতিবাদী

চলচ্চিত্রের একটি দৃশ্যে দেখা যায়, ডা. এজাজ মাহমুদের সাথে হাত মেলাতে চায়। সে মাস্টারের সাথে হাত মেলায় না। সে মাস্টারের খারাপ কাজের প্রতিবাদ করে। এখানে নায়ককে নির্মাণ করা হয়েছে প্রতিবাদী হিসেবে।

নায়কের খুন কোনো অপরাধ নয়

পুরো চলচ্চিত্রটিতে দেখা যায় নায়ক বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জনকে খুন করে। খুন করা যেন নায়কের কাছে কোনো অপরাধ নয়। সে কোনো অনুশোচনায় ভোগে না। এটা তার কাছে একটা স্বাভাবিক বিষয়।

৭.১.৩ বর্ণনকৌশল (Narration)

খোঁজ দ্যা সার্চ চলচ্চিত্রটি একজন খারাপ অন্যায়কারী, অস্ত্র ব্যবসায়ী ও সরবরাহকারী মাফিয়া ডন নিনোকে খুঁজে বের করার কাহিনি। পরিচালক সিনেমায় সরল রৈখিক বর্ণনা দিয়েছেন। এই চলচ্চিত্রের বর্ণনা ঢং নিয়ে পরিচালক তেমন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেননি। চলচ্চিত্রটিতে একটি মাত্র দৃশ্যে দেখতে পাওয়া যায় নায়ক মাহমুদের মা ছেলেকে বিয়ে করতে বলে। এই দৃশ্য ব্যতিত অন্য কোনো পারিবারিক কাহিনি এই চলচ্চিত্রটিতে দেখা যায়নি।

পুরো চলচ্চিত্রটিতে নায়ক মাহমুদই একমাত্র পূর্ণাঙ্গ চরিত্র হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এই চরিত্রটিকে ঘিরেই অন্যান্য চরিত্র আবর্তিত। প্রতিটি চরিত্রই কোনো না কোনো ভাবে নায়ক মাহমুদের সাথে সম্পৃক্ত ও নির্ভরশীল। আমরা দেখি যে বাংলাদেশ সিক্রেট সার্ভিসের প্রধান সোহেল রানা তার কাজের জন্য নায়ক মাহমুদের উপর বেশি আস্থা রাখে। সে মনে করে মাহমুদই একমাত্র লোক যার উপর আস্থা রাখা যায়।

চলচ্চিত্রটিতে দেখানো হয়েছে যে, নায়ক মাহমুদ নিনোকে মায়ানমারে ধরতে যায়। সেখানে তার সাথে নিনোর লোকদের মারামারি হয়। মারামারির এক পর্যায়ে নিনো তাকে মাথার পিছনে আঘাত করে। এতে নায়ক জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। জ্ঞান ফিরে পাবার পর দেখা যায় নায়ক তার সব স্মৃতি ভুলে গিয়েছে। তখন নিনোর লোকরা তাকে তাদের মতো করে গড়ে তোলার চেষ্টা করে। চলচ্চিত্রের গল্পের এখানে ছন্দ পতন ঘটে। যে নায়ক দেশকে সন্ত্রাসমুক্ত করার জন্য কাজ করে, তাকেই এখন স্মৃতি হারিয়ে সন্ত্রাসীদের সাথে কাজ করতে দেখা যায়। এই চলচ্চিত্রের একটি বিশেষত্ব হলো এর গান।

৭.২ *হৃদয় ভাঙ্গা ঢেউ*

হৃদয় ভাঙ্গা ঢেউ চলচ্চিত্রটি ২০১১ সালে মুক্তি পায়। গাজী মাজহারুল আনোয়ার পরিচালিত অনন্ত জলিল অভিনীত দ্বিতীয় চলচ্চিত্র এটি। মনসুন ফিল্ম পরিবেশিত এ ছবির প্রযোজনা করেছেন এম এ জলিল অনন্ত।

৭.২.১ কাহিনি (Histoire)

এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তি আলম খান। সে তার প্রভাব খাটিয়ে এলাকার বিভিন্ন মেয়েকে বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে ভোগ করে। একবার এক মেয়ের গর্ভে সন্তান আসে। সন্তান জন্ম দেয়ার পর আলম খান তাকে মেরে ফেলে এবং তার সন্তানকে জঙ্গলে ফেলে দেয়া হয়। তাকে কুড়িয়ে পায় আলম খানের স্ত্রী সারা। বিষয়টি আলম খান জানতে পারলে সে সারাকে ছেলেটিকে মানুষ হবে না বলে ফেলে দিতে বলে। তখন সারা চ্যালেঞ্জ করে বলে আমি ওকে মানুষ করেই ছাড়ব। এদিকে আলম খান ছেলেটিকে বিভিন্নভাবে নষ্ট করার জন্য চেষ্টা করে।

আলম খান এলাকার সব জমি জোর করে দখল করার চেষ্টা করে। এরকম এক লোকের জমি দখলের সময় সে তার জমি স্বেচ্ছায় দিতে রাজি না হলে তার হাতের আঙুল কেটে ফেলে এবং তাকে বস্তায় বন্দি করে সমুদ্রে ফেলে দেয়। এসময় উদ্ধারকর্তা হিসাবে আগমন ঘটে নায়কের।

আলম খান অনন্তকে হুমকি দেয় তার কথামত না চললে তার মাকে মেরে ফেলা হবে। অনন্ত তার মায়ের প্রতি ভালোবাসা দেখাতে গিয়ে তার পিতার বিভিন্ন খারাপ কাজের সাথে জড়িয়ে পড়ে। একসময় তার পিতার খুনের দায়ভার চাপিয়ে দেয়া হয় অনন্তের উপর। অনন্তকে জেলে পাঠানো হয়।

তার বাবা তাকে মারার জন্য লোক পাঠায় জেলে। সে জেল থেকে পালিয়ে মাকে বাঁচানোর জন্য ছুটে আসে। কিন্তু মা তার ছেলের সাজার মেয়াদ বেড়ে যাবে বলে পুলিশের কাছে তাকে দিয়ে দেয়। কিন্তু ঐ পুলিশরা ছিল ভুয়া এবং তারা আলম খানের লোক। পরে সত্যিকারের পুলিশ যায়। ভুয়া পুলিশরা যখন তাকে নিয়ে যাচ্ছিল তখন সে তাদের পায়ের জুতা দেখে চিনে ফেলে। ফলে তাদের সাথে অনন্তের মারামারি হয়। এখানেও তাকে বিভিন্ন দিক থেকে গুলি করা হলেও সে অক্ষত থেকে যায়। সে সাহসী এবং সদা মারামারি করার জন্য প্রস্তুত। তারপর সে একটা নৌকার মধ্যে কয়েকজনকে মেরে তাদের কাপড় পরে ছদ্মবেশ নেয়। পুলিশের হাতে ধরা-পড়া এড়াতে সে সমুদ্রে ঝাঁপ দেয়।

এদিকে অনন্ত একটি দ্বীপে বসবাস শুরু করে। হঠাৎ অনন্ত দেখে যে একটি মেয়ে সমুদ্রের পাড়ে পড়ে আছে। সে মেয়েটিকে তুলে তার কুঠিঘরে নিয়ে আসে। সে মেয়েটির প্রাথমিক চিকিৎসা করে। এই মেয়েটিই ছবির নায়িকা। সকালে ঘুম ভাঙলে নায়িকা পালিয়ে যেতে চায়। তখন সে অনন্তকে দেখে এবং তাকে না মারার জন্য হাতজোড় করে অনুরোধ জানায়। নায়ক তাকে অভয় দেয়।

নায়িকা তার পরিচয়ে বলে সে বিশ্ববিদ্যালয় পড়ে। এলাকার বখাটে ছেলে তার বাবাকে মেরে তাকে ধর্ষণ করার চেষ্টা করলে সে কোনোমতে পালিয়ে যায় এবং সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। এরই মাঝে রাতে নায়িকার জ্বর আসে। নায়ক তখন তার সেবাযত্ন করে। বর্ষা অনন্তকে ভালবেসে ফেলে; কিন্তু অনন্ত বর্ষাকে ভালবাসতে চায় না।

রাজ্জাক সারার সাথে দেখা করে বলে যে, অনন্ত যে খুনের দায় নিয়ে পালিয়ে আছে সে খুন অনন্ত করেনি। তখন সারা কারণ জানতে চাইলে রাজ্জাক বলেন কারণটা আপনি। কারণ অনন্ত আপনাকে খুব ভালোবাসে বলে আপনার কোন ক্ষতি হোক সে তা চায় না।

রাজ্জাক আসল খুনীকে বের করে অনন্তকে মুক্ত করতে বিভিন্ন তথ্য খোঁজার চেষ্টা করছে। অনন্ত এবং বর্ষা যে দ্বীপে আশ্রয় নিয়েছে আলম খান সে নতুন দ্বীপের সন্ধান পান। ইতোমধ্যে বর্ষা অনন্তের প্রেমে বুদ হয়ে যায়।

আলম খান তার লোকজন নিয়ে দ্বীপ দখল করতে আসে। ইতোমধ্যে আলম খান বর্ষাকে দেখে ফেলে এবং তার লোলুপ দৃষ্টি পড়ে বর্ষার উপর। আলম খান বর্ষাকে নৌকায় করে তার ডেরায় নিয়ে যায়।

আলম খান যখন বর্ষাকে ভোগ করার জন্য উদ্ধত হয় তখন অনন্ত এসে বর্ষাকে আলম খানের হাত থেকে রক্ষা করে। আলম খান গুলি করতে চাইলে তখন সারা এসে আলম খানকে বাধা দেয়। সারা অনন্তকে চলে যেতে বললে অনন্ত বলে মা আমি তোমাকে রেখে যাব না।

অনন্তকে গুলি করলে বর্ষা ও অনন্ত নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। রাজ্জাক সারাকে বাঁচায়। তখন রাজ্জাক সারাকে বলে আলম খানকে গুলি করার জন্য। এই দিকে অনন্ত ও বর্ষা সমুদ্রে পড়েও বেঁচে ওঠে।

তখন পুলিশ এসে অনন্তকে গ্রেফতার করতে চাইলে রাজ্জাক বলে, আসল খুনি অনন্ত নয় আলম খান। আলম খান অনন্তের কাছে ক্ষমা চাইলেও অনন্ত আলম খানকে ক্ষমা করে না। ফলে আলম খানকে পুলিশ নিয়ে যায়। আলম খানের ফাঁসি হয় এবং অনন্তকে খালাস দেয়া হয়।

৭.২.২ বক্তব্য (Recit)

এই সিনেমায় নানা বক্তব্যের মাধ্যমে নায়ককে অভিভাবকহীন, মাতৃভক্ত, বুদ্ধিমান ও সহযোগিতাপরায়ণ হিসেবে দেখানো হয়েছে।

নায়ক অভিভাবকহীন

চলচ্চিত্রটিতে নায়ককে দেখানো হয়েছে পালিত সন্তান হিসেবে বড় হতে। আলম খানের লোভ-লালসার ফসল হলো নায়ক। আলম খানের স্ত্রী সারা (দিতি) নায়ককে জঙ্গলে কুড়িয়ে পায়। সৌভাগ্যক্রমে আলম খানের ঘরেই বড় হতে লাগলো নায়ক। পরবর্তীতে সারা তার পরিচয় বলে দেয়। বলে, সে তার সন্তান নয়। তারপর থেকে সে নিজেকে অভিভাবকহীন ভাবে, কিন্তু তার মাকে সে খুব ভালবাসে।

মাতৃভক্ত নায়ক

অনন্ত তার মাকে অনেক বেশি ভালোবাসে। যখন সে বড় হয় তখন আলম খান তাকে দিয়ে তার বিভিন্ন খারাপ কাজ করাতো। যদি সে না করে তবে তার মাকে মেরে ফেলা হবে এই ভয়ে এবং মায়ের প্রতি ভালোবাসার জন্য সে আলম খানের সব অন্যায় মেনে নেয়।

নায়ক বুদ্ধিমান

চলচ্চিত্রটিতে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে নায়ককে বুদ্ধিমান হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। চলচ্চিত্রের একটি দৃশ্যে দেখানো হয়েছে, নায়ক আলম খানের হাত থেকে বাঁচার জন্য পালিয়ে যায়। পালিয়ে গিয়ে সে একটা জনমানবহীন দ্বীপে আশ্রয় নেয়। যেখানে কোনো থাকার ব্যবস্থা বা কোনো খাবারের ব্যবস্থা ছিল না। নায়ক বুদ্ধি করে সেখানে থাকার জন্য একটা ঘর তৈরি করে। খাওয়ার জন্য সে বুদ্ধি করে সমুদ্র থেকে মাছ ধরে। পাথর ঘষে আগুন জ্বালিয়ে সে মাছ পুড়িয়ে খায়। এগুলো নায়কের বুদ্ধিমত্তার পরিচয়ই বহন করে।

নায়ক সহযোগিতাপরায়ণ

চলচ্চিত্রটিতে আমরা নায়ককে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সহযোগিতামূলক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে উপস্থাপন করতে দেখেছি। আলম খান একবার এক লোককে হাত পা বেঁধে বস্তায় ভরে সমুদ্রে ফেলে দেয়। নায়ক তাকে সমুদ্র থেকে উদ্ধার করে। আবার, অনন্ত যখন আলম খানের হাত থেকে ও জেল থেকে পালিয়ে দ্বীপে আশ্রয় নেয় তখন একটা সময় সমুদ্রে ভেসে আসে একটা মেয়ে। সে মেয়েটিকে সমুদ্র থেকে তুলে সেবা-যত্ন করে ভালো করে তোলে। মেয়েটি ছবির নায়িকা। আবার, একবার নায়িকা সমুদ্রে গোসল করতে গেলে হাঙ্গর তাকে আক্রমণ করে। অনন্ত তখন তাকে ছুটে গিয়ে বাঁচায়।

সহিংসতা নায়কের প্রধান হাতিয়ার

পুরো চলচ্চিত্র জুড়ে আমরা দেখি নায়ক বিভিন্ন সহিংস কর্মকাণ্ড করে বেড়ায়। পুরো চলচ্চিত্রে আলম খানের লোকজনের সাথে মারামারি করতে দেখা যায় তাকে। অনন্ত যখন মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার হয়ে জেলে যায় তখন সে জেলের ভেতরেও মারামারি করে।

৭.২.৩ বর্ণনকৌশল (Narration)

চলচ্চিত্রের বর্ণনকৌশল লিনিয়ার বা সরল বর্ণনাক্রম অনুসরণে নির্মিত হয়েছে। পুরো কাহিনির উপস্থাপনায় ছিল সরল বর্ণনামূলক ঢং। হলিউডে বিশ শতকের বিশের দশকে গড়ে উঠেছে এ ধারাটি। এখানে হঠাৎ করে গল্পের সূত্রপাত হয়নি। বরং শুরু হয়েছে নায়ক অনন্তের বাল্যকাল থেকে। মিলনাত্মক ধারায় বর্ণিত চলচ্চিত্রের কাহিনিতে ঘটনাক্রমে নানা ক্লাইমেক্স তৈরি হয়। জটিলতা নিরসনের মধ্য দিয়ে এর অবসানও ঘটে। সংলাপ ও ভিজ্যুয়াল নির্ভর এই সিনেমায় নায়ক-নায়িকার উপস্থিতি লক্ষণীয়। তবে এই জুটিটির প্রেম দেখানো হয় হঠাৎ করে। দ্বীপে এসে তাদের হঠাৎ প্রেম হয়।

চলচ্চিত্রটিতে আমরা দেখতে পাই নায়ক জেল থেকে পালিয়ে একটা দ্বীপে গিয়ে ওঠে। একা একা সে কয়েকদিন বসবাস করে। হঠাৎ একদিন নায়িকাও ঐ দ্বীপে ভাসতে ভাসতে আসে। নায়ক-নায়িকার আলাপচারিতার অনেকগুলো দৃশ্য দেখানো হয় সিনেমাটিতে। ঘটনাক্রমে একবার নায়িকার জ্বর হলে নায়ক তাকে সেবাযত্ন করে সুস্থ করে তোলে। এর মাধ্যমে তাদের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। একটা জনমানবহীন দ্বীপ, সেখানে নায়ক আসলো, এ পর্যন্ত হয়ত মানা যায়; কিন্তু একই দ্বীপে নায়িকাও চলে এসেছে – ব্যাপারটা খুব একটা মানানসই হয়নি।

চলচ্চিত্রের মূল চরিত্র হলো অনন্ত, সারা, আলম খান, রাজ্জাক, কাবিলা। এর মাঝে মূলত অনন্তের উপর ফোকাস করে গল্প এগিয়ে গেছে। অর্থাৎ অনন্ত চরিত্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে গিয়ে অন্য চরিত্রগুলো অনেক ক্ষেত্রেই ডাউন পে করা হয়েছে। অনন্ত কখনো শত্রুর কাছে পরাজিত হয় না। এমনকি সশস্ত্র শত্রুর কাছে নায়ক নিরস্ত্র থাকলেও পরাজিত হয় না। অন্যরা যেখানে ব্যর্থ, নায়ক সেখানে সফল। নায়ক-প্রধান এই ছবিতে নায়িকা চরিত্রটি বেশ গৌণ প্রতীয়মান হয়। নায়িকাকে শুধু দেখানো হয়েছে প্রেমের অনুষঙ্গ হিসেবে।

৭.৩ *দ্যা স্পীড*

দ্যা স্পীড চলচ্চিত্রটি ২০১২ সালে মুক্তি পায়। সোহানুর রহমান সোহান পরিচালিত অনন্ত জলিল অভিনীত তৃতীয় চলচ্চিত্র এটি। মনসুন ফিল্ম পরিবেশিত এ ছবিটি যৌথ প্রযোজনা করেছেন এম এ জলিল অনন্ত (বাংলাদেশ) ও মি. সিভারামান (মালয়েশিয়া)।

৭.৩.১ কাহিনি (Histoire)

নায়ক AJI Group এর মালিক। কিবরিয়ার একটি গ্রুপ অব কোম্পানি থাকে। সেটা AJI Group-এর জন্য মার খেয়ে যাচ্ছিল। তাই তার গ্রুপের সবাই বৈঠকে বসলো। গ্রুপের অন্য মেম্বাররা বলে তাদের কোম্পানি মার খেয়ে যাচ্ছে তাই তারা অনন্যের সাথে হাত মেলাতে চায়। আলমগীর বলে আমি যতদূর জানি অনন্য কখনো অন্যায়ের সাথে আপস করে না। ফ্যাক্টরিতে মেশিনে সমস্যা দেখা দিলে নায়ক নিজেই মুহূর্তেই সেটা ঠিক করে ফেলে। যেটা টেকনিশিয়ান ঠিক করতে পারছিল না।

আলমগীর অনন্যকে ফোন করে বলে আপনি আমাদের পথ থেকে সরে দাঁড়ান। অনন্য বলে, আমিতো আপনার পথে নেই। তখন আলমগীর তাকে দেশ ছাড়তে বললে অনন্য বলে আমার বাবা মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন, দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছেন। আর আমি তার ছেলে হয়ে দেশ ছাড়বো?

ডন সন্ত্রাসী। আলমগীর ডনের সাথে দেখা করে অনন্যকে মেরে ফেলার জন্য বলে যায়। ডন যখন অনন্যকে খুন করতে যায় তখন একা নায়ক ডনের দলের সবাইকে মেরে রেখে যায়। কিন্তু থাকে পুরোপুরি অক্ষত।

অনন্য অফিসে যাওয়ার সময় একটি ছেলে আসে। গার্ড তাকে বেরিয়ে যেতে বললে অনন্য বলে, ওকে আসতে দাও। তারপর অনন্যের সাথে ছেলেটির দেখা হয়। ছেলেটি বলে, স্যার শুনেছি আপনি মেধার দাম দেন। তাই অফিসে না পেয়ে বাসায় চলে এসেছি। ছেলেটি অনন্যের পায়ে পড়ে চাকরি চায়। অনন্য বলে তুমি তোমার যোগ্যতা বলে চাকরি পাবে। তুমি কাল থেকে কাজে যোগদান করবে।

নায়িকার ভাই অনন্যের অফিসে চাকরি করে। নায়িকাকে যখন তার ভাই বাসায় পৌঁছে দেবার জন্য নিয়ে যাচ্ছিল তখন অনন্যের ফোন আসে নায়িকার ভাইয়ের ফোনে অফিসে আগুন লাগে বলে। অনন্য নিজে শ্রমিদেরকে আগুন থেকে রক্ষা করে হাসপাতালে নিয়ে যায় তার গাড়িতে করে। এটা দেখে নায়িকা নায়কের প্রেমে পড়ে যায়।

নায়িকা ইংল্যান্ড থেকে ফ্যাশন ডিজাইনিংয়ের উপর পড়াশোনা করে এসে AJI Group-এ যোগদান করতে চায়। নায়িকার চাকরি হয়ে যায় AJI Group-এ। নায়িকা যখন তার কাজ দেখানোর জন্য তার বসের রুমে যায় তখন অনন্যের ফোনে দৃষ্টির স্কুল থেকে একটা ফোন আসে। অনন্যের দৃষ্টি নামে একটি ভাতিজি থাকে। অনন্য তখন মিটিংয়ে ব্যস্ত। তখন সে-ই ফোনটা ধরে। ফোনে বলা হয় দৃষ্টির স্কুল ছুটি হয়ে গেছে। যেহেতু অনন্য ব্যস্ত, তাই সে নিজেই দৃষ্টিকে আনতে স্কুলে যায়।

অনন্য সন্ধ্যাকে চাকরি থেকে বাদ দিয়ে দেয় সন্ধ্যাকে বিয়ে করবে বলে। বিয়ে হয়। তারা যখন হানিমুনে যায় তখন আক্রমণ করে কিবরিয়ার সন্ত্রাসীরা। নায়ক একাই সবাইকে দমন করে। সে নায়িকাকে রক্ষা করে। কিন্তু দৃষ্টি সন্ত্রাসীদের গুলিতে মারা যায়।

তার কিছুদিন পর অনন্য সন্ধ্যাসহ ব্যবসায়ের কাজে মালয়েশিয়া যায়। সেখানেও এন্ড্রুর সন্ত্রাসীরা তাকে খুন করার সুযোগ খোঁজে। একদিন কিবরিয়ার লোক সন্ধ্যাকে তুলে নিয়ে যায়। কিবরিয়া গুলি করে অনন্যকে। অনন্যকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অসুস্থ অনন্যকে তারা তার স্ত্রীকে উদ্ধার করার জন্য পাঁচদিন সময় দেয়। অনন্য হাসপাতাল থেকে বের হয়ে আসে।

এইদিকে কিবরিয়া সন্ধ্যাকে বিভিন্নভাবে কষ্ট দিতে থাকে। অনন্য প্রস্তুত হয়ে কিবরিয়ার বাসায় গিয়ে গার্ডদের খুন করে। তারপর এন্ড্রুকে খুন করে। কিবরিয়া অনন্যকে একটা ঘড়ি দেয় যে ঘড়িতে কিবরিয়া কিংবা তার লোকরা তাকালে সন্ধ্যা মুক্তি পেত। কিন্তু তারা নিজেকে খুন করে। ফলে অনন্য আর কোন উপায় না দেখে সৃষ্টিকর্তার শরণাপন্ন হয়। কাচের দেয়াল ভেঙে গেলে সন্ধ্যাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে অনন্য। মালয়েশিয়ার সরকার অনন্যকে পুরস্কৃত করে কারণ সে সব সন্ত্রাসীদের শেষ করেছে। তার খুনের জন্য শাস্তি হয় না; বরং সে পুরস্কার পায় চার মিলিয়ন রিঙ্গিত।

৭.৩.২ বক্তব্য (Recit)

এই সিনেমায় নানা বক্তব্যের মাধ্যমে নায়ককে সফল ব্যবসায়ী, যোগ্যতার মূল্যদাতা, দেশপ্রেমিক, মহানুভব, সৎ ও সাহসী, নীতিবান এবং উদ্ধারকর্তা হিসেবে দেখানো হয়েছে।

নায়ক সফল ব্যবসায়ী

চলচ্চিত্রটিতে নায়ককে একজন সফল ব্যবসায়ী হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। নায়ক AJI Group-এর মালিক। সে খুব সৎভাবে ব্যবসা করে; ফলে সে ব্যবসা জগতে একজন সফল ব্যবসায়ী। তার সাথে কোনো ব্যবসায়ী পেরে ওঠে না।

নায়ক যোগ্যতার মূল্য দেন

সিনেমার প্রথম দিকে দেখা যায় নায়ক যখন তার অফিসে যাওয়ার জন্য বের হয় তখন এক যুবক আসে তার কাছে চাকরির জন্য। যুবকটি বলে যে তার যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কোনো চাকরি হচ্ছে না। নায়ক তার কাগজপত্র দেখে বলে, আপনি আগামীকাল অফিসে এসে যোগদান করুন।

নায়ক মহানুভব

একবার অনন্যের গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে আগুন লাগে। তখন নায়ক নিজে তার শ্রমিকদের রক্ষা করার জন্য নিজেই তাদের উদ্ধার করে। তার নিজ গাড়িতে করে তাদের হাসপাতালে নিয়ে যায়।

নায়ক দেশপ্রেমিক

নায়ক অনন্য বিয়ে করে তার অফিসের এক কর্মকর্তার বোনকে। যে ছবির নায়িকা। বিয়ের পর নায়ক তার স্ত্রীকে নিয়ে হানিমুনে যাওয়ার জন্য বাসায় বসে পরিকল্পনা করছিল। সবাই হানিমুনে যাওয়ার জন্য দেশের বাইরের কোনো স্থানের কথা বলছিল। নায়ক তখন বলে, না, হানিমুন দেশেই হবে। কারণ আমাদের দেশের এমন অনেক জায়গা আছে যা বিদেশের চেয়ে সুন্দর এবং আমাদের দেশে প্রতিবছর এসব স্থান দেখার জন্য অনেক পর্যটক আসে। আবার নায়ক বিভিন্ন সময় বলে, তার বাবা একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন; তাই সে কোন অন্যায়ের কাছে মাথা নত করবে না। এসব দৃশ্যের মাধ্যমে তাকে দেশপ্রেমিক হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

নায়ক সৎ ও নীতিবান

নায়ক AJI Group-এর মালিক। অন্য এক ব্যবসায়ী গ্রুপের সবাই বৈঠকে বসলে, গ্রুপের মেম্বাররা বলে তাদের কোম্পানি মার খেয়ে যাচ্ছে; তাই তারা অনন্যের সাথে হাত মেলাতে চায়। আলমগীর বলে, আমি যতদূর জানি, অনন্য কখনো অন্যায়ের সাথে আপস করে না। এখানে নায়ককে নির্মাণ করা হয়েছে ন্যায়বান ও সৎ হিসেবে।

নায়ক স্নেহশীল

চলচ্চিত্রটিতে নায়কের সাথে থাকে তার বড় ভাইয়ের একটি ছোট মেয়ে। মেয়েটির নাম দৃষ্টি। দৃষ্টি ছোটবেলাতেই তার বাবা-মাকে হারিয়েছে। সে তার চাচ্চুর সাথে থাকে। নায়ক তার ভাতিজিকে তার জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবাসে। চাচ্চু তাকে আদর না করলে সে খায় না, ঘুমায় না। আর চাচ্চুও তার ভাতিজিকে আদর না করে কোনো কিছু করে না।

নায়ক উদ্ধারকর্তা

নায়ক তার স্ত্রীকে নিয়ে ব্যবসায়িক কাজে একবার মালয়েশিয়া যায়। সেখানে কিবরিয়ার লোক অনন্যকে গুলি করে তার স্ত্রী সন্ধ্যাকে তুলে নিয়ে যায়। নায়ককে হাসপাতালে নেয়া হয়। হাসপাতাল থেকে সে একটু সুস্থ হলে তার স্ত্রীর খোঁজ করতে থাকে। সিনেমার শেষ দৃশ্যে নায়ক তার স্ত্রীকে কিবরিয়া খানের কবল থেকে উদ্ধার করে। আবার, একদিন সন্ধ্যার সময় সে রাস্তা দিয়ে হাঁটছিল; তখন দেখে যে কয়েকজন লোক একটি মেয়েকে ধর্ষণের চেষ্টা করছে। নায়ক তাদের হাত থেকে মেয়েটিকে রক্ষা করে।

৭.৩.৩ বর্ণনকৌশল (Narration)

দ্যা স্পীড চলচ্চিত্রের কাহিনির উপস্থাপনায় সাধারণ বর্ণনা-কাঠামো অনুসৃত। কাহিনির গাঁথুনিতে বিশ্বাসযোগ্যতায় নানা ধরনের ভুল রয়ে গেছে। অনেক ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত তথ্য দেয়া হয়নি। পুরো গল্পের বর্ণনায় একটি শটের সাথে আরেকটি শটের আন্তঃমিলের অভাব লক্ষণীয়। যখন নায়ক তার স্ত্রীকে উদ্ধার করতে যায় তখন কাচের ঘর ভাঙতে না পারায় সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করলে কাঁচের ঘর নিজে নিজেই ভেঙে যায়। এই ধরনের বর্ণনা চলচ্চিত্রটির বিশ্বাসযোগ্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।

স্পীড চলচ্চিত্রটিতে আমরা শুধু দুই পুরুষের ক্ষমতার দ্বন্দ্বই দেখতে পাই। নারীদেরকে দেখতে পাই অসহায় চরিত্র হিসেবে। চলচ্চিত্রের সঙ্গীত-আয়োজনে অবশ্য কিছু মুনশিয়ানা আছে। ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের সার্থক প্রয়োগ হয়েছে এখানে।

৮.০ ফলাফল উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ

গবেষণাপত্রের এ অংশটি সাজানো হয়েছে এর আগের তথ্য উপস্থাপনের আলোকে। এই অধ্যায়ে অনন্ত জলিল অভিনীত তিনটি চলচ্চিত্রে নায়ক নির্মাণ নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। পাশাপাশি উল্লেখিত গবেষণা-প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে এই বিশ্লেষণের মাধ্যমে।

নির্বাচিত চলচ্চিত্রগুলোতে নায়ককে ঘিরেই পুরো বক্তব্য আবর্তিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় চরিত্র হওয়ার কারণে চলচ্চিত্রগুলো বর্ণিত হয়েছে নায়কের পৌরুষ, শৌর্য-বীর্যের বক্তব্য। নির্বাচিত তিনটি চলচ্চিত্রেই নায়ক করেছে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই, লড়াইয়ে বিজয় হচ্ছে তার। একা হয়েও শত্রুবাহিনীকে ঘায়েল করছে সহজে।

৮.১ সুপার হিরো, নানা গুণের সমাবেশ

বাংলা চলচ্চিত্রে আমরা নায়ককে প্রবল শক্তিধর পুরুষ হিসেবে দেখতে পাই। *খোঁজ:দ্যা সার্চ* চলচ্চিত্রে নায়ক সাহসী মেজর। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সে প্রতিবাদী, সে দেশপ্রেমিক। ন্যায়ের পক্ষে তার অবস্থান। তার এই সংগ্রামে সে একা। সে একা লড়াই করে অস্ত্র ব্যবসায়ী, মাফিয়া ডন নিনো ও নবাব এবং তাদের লোকজনদের সাথে। সে একা হলেও তার কোনো বড় ধরনের ক্ষতি হয় না। নিনো ও নবাবের সাথে যারা ঝামেলা করে তারা তাদের নির্মম ভাবে খুন করে। কিন্তু নায়ক মাহমুদের বেলায় বিষয়টি ভিন্ন। সে একা হয়েও লড়াই করছে দুজন প্রভাবশালী সন্ত্রাসী ও তাদের সহযোগীদের সাথে।

হৃদয় ভাঙ্গা ঢেউ চলচ্চিত্রটিতে শুরুতেই নায়ক উদ্ধারকর্তা হিসেবে আবির্ভূত হয়। আলম খানের লোকজন এক কৃষককে বস্তায় ভরে সমুদ্রে ফেলে দিলে নায়ক সমুদ্র থেকে তাকে উদ্ধার করে। এখানে নায়ককে আমরা সুপার হিরো হিসেবে পাই যখন সে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সে কোনো কিছুর সাহায্য ছাড়াই সাঁতরে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে একটা দ্বীপে গিয়ে ওঠে। দ্বীপটি ছিল জনমানবহীন। সেখানে সে তার বুদ্ধি খাটিয়ে জীবন ধারণ করে। সে বর্শা বানিয়ে মাছ ধরে। থাকার জন্য বাড়ি বানায়। নায়িকা সমুদ্রে গোসল করতে গেলে হাঙ্গর তাকে আক্রমণ করলে সে কোনো কিছুর সাহায্য ছাড়াই তাকে সুপার হিরোর মতো উদ্ধার করে।

দ্বীপ থেকে যখন আলম খানের লোকেরা নায়িকাকে তুলে নিয়ে যায় তখন নায়ক বাঁশ দিয়ে ভেলা বানিয়ে তাদের পিছু নেয়। তারপর ঠিকই আলম খানের আস্তানায় পৌঁছে যায়। সেখানে আলম খানের লোকজনের সাথে তার ব্যাপক মারামারি হয়। সে অক্ষত অবস্থায় থেকে যায়। সে এখানে সুপার হিরো।

দ্যা স্পীড চলচ্চিত্রটিতেও অনুরূপভাবে নায়ক নির্মাণ করা হয়েছে। নায়ক সফল ব্যবসায়ী। ব্যবসায়িক কারণে কিবরিয়া খানের সাথে তার দ্বন্দ্ব। শুরুর দিকে নায়ককে মারার জন্য কিবরিয়া ডনকে পাঠায়। নায়ক তাকে এবং তার দলবলের সবাইকে মেরে তাকে কিবরিয়া খানের কাছে নিয়ে আসে। ফ্যাক্টরিতে মেশিনে সমস্যা দেখা দিলে নায়ক নিজে মুহূর্তেই সেটা ঠিক করে ফেলে। যেটা টেকনিশিয়ান ঠিক করতে পারছিল না।

নায়ক তার স্ত্রীকে নিয়ে মালয়েশিয়া যায় ব্যবসা-সংক্রান্ত কাজে। সেখানে কিবরিয়া ও এন্ড্রুর লোকেরা নায়ককে গুলি করে। গুলি তার বুকে লাগলেও সে মরে না। বেঁচে যায়। হাসপাতাল থেকে সে সম্পূর্ণ সুস্থ না হয়েও তার স্ত্রীকে উদ্ধারে যায়। সেখানে সবাইকে একাই মেরে স্ত্রীকে উদ্ধার করে।

এখানে নায়কের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো, সে কখনো পরাজিত হয় না। তা সে সশস্ত্র হোক আর নিরস্ত্রই হোক। যদিও-বা কোনো কারণে সে পরাজিত হয় তবে সেই সময় সে থাকে মাতাল, কিংবা পরিস্থিতির চাপে বাধ্য হয়ে তাকে মার খেতে হয়।

৮.২ নায়ক অতিমানব

বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে আমরা দেখেছি, নায়ককে সাধারণত নির্মাণ করা হয় অতিমানব হিসেবে। নায়ক সকল সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে। তারা সব কাজ করতে পারে। সর্বগুণে তারা গুণান্বিত। নায়ক যেমন শৌর্য-বীর্যে বলীয়ান

তেমনি সে সুদর্শন এবং বুদ্ধিমান। অনন্ত জলিলের তিনটি চলচ্চিত্রেই নায়ককে নির্মাণ করা হয়েছে সুপার হিরো বা অতিমানব হিসেবে।

প্রত্যেকটি চলচ্চিত্রে নায়ক একাই সব কাজ করে। সে কারো সাহায্য নেয় না। সে সব অন্যায়ের প্রতিবাদ করে। সন্ত্রাসীদের একা দমন করে। সবার ক্ষতি হলেও তার কোনো ক্ষতি হয় না। তাকে গুলি করলেও তার গায়ে লাগে না। লাগলেও তার কোনো ক্ষতি হয় না বা মরে না। তার পিস্তলের গুলি যেন শেষ হয় না। তার গুলি খেয়ে সবাই মারা যায়। এ যেন অতিমানবের এক রূপ।

চলচ্চিত্র তিনটির মধ্যে শুধু *দ্যা স্পীড*-এ একবার নায়কের গায়ে গুলি লাগে। তাতে তার কিছু হয় না। *খোঁজ দ্যা সার্চ* চলচ্চিত্রটিতে আমরা দেখি যে নায়ক সবকিছু চালাতে পারে। হেলিকপ্টার, স্পিড বোট সব চালনাতেই সে দক্ষ। *খোঁজ দ্যা সার্চ* চলচ্চিত্রটিতে নায়ককে মাথায় আঘাত করা হয়। সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। তার সব স্মৃতি মুছে যায়। সে সব ভুলে যায়। কিন্তু নায়ক তার ভুলে যাওয়া স্মৃতি নিয়েই সব কিছু মনে করতে চায়।

৮.৩ নায়কের পুরুষত্বে নায়িকার অবদমন

উক্ত তিনটি চলচ্চিত্রেরই পুরো অংশ জুড়ে ছিল নায়কের পুরুষত্বের প্রকাশ। এই প্রকাশে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অবদমিত হয় নায়িকা। তার উপর চলে নায়কের শ্রেষ্ঠত্ব, দৌর্দণ্ড প্রতাপ। নায়িকাকে কখনো সন্ত্রাসীদের আক্রমণের শিকার করিয়ে নায়ক কর্তৃক উদ্ধারের মাধ্যমে তার পৌরুষ প্রদর্শন করা হয়। আবার কখনো নায়ক নিজেই তার বাচনিকভঙ্গি ও সংলাপের মাধ্যমে নায়িকার উপর পৌরুষ প্রকাশ করে। চলচ্চিত্রে নারীকে অধস্তন করে তোলার পেছনে আসল কারণ লুকিয়ে থাকে পুরুষতন্ত্রের ভেতরে। ধর্ষণ প্রকৃতপক্ষে পুরুষতন্ত্রের এক হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। নারীর এই অসহায়ত্বের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় পুরুষের বিক্রম এবং পরাক্রমশীলতা।

নির্বাচিত তিনটি চলচ্চিত্রেই দেখা গেছে নায়িকা আক্রান্ত। আর তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে নায়ক। *খোঁজ দ্যা সার্চ* সিনেমায় নায়িকা ক্যাপ্টেন ববি (ববি) ও এলিসা (বর্ষা) আক্রান্ত হচ্ছে সন্ত্রাসীদের দ্বারা। ত্রাতা হিসেবে উপস্থিত হচ্ছে নায়ক মেজর মাহমুদ (অনন্ত)। সন্ত্রাসী ও মাফিয়া ডন নিনোর লোকজন ক্যাপ্টেন ববির উপর হামলা করে এবং নবাব তার বোন এলিসাকে তুলে আনার জন্য সন্ত্রাসী পাঠায়। তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে নায়ক মাহমুদ।

হৃদয় ভাঙ্গা ঢেউ চলচ্চিত্রে নায়ককে নায়িকার উদ্ধারকর্তা হিসেবে দেখা যায়। নায়ক ও নায়িকা যখন কাকতালীয়ভাবে একই দ্বীপে বসবাস করে, তখন আলম খানের লোকেরা নায়িকাকে তুলে নিয়ে যায়। আলম খান যখন নায়িকাকে ভোগ করতে চায় তখন নায়ক নায়িকাকে উদ্ধার করে। *দ্যা স্পীড* চলচ্চিত্রে নায়ক-নায়িকা হানিমুনে গেলে সন্ত্রাসীরা তাদের উপর হামলা করে। তখন নায়ক তাকে রক্ষা করে। আবার ব্যবসায়িক কাজে মালয়েশিয়া গেলে কিবরিয়ার লোকেরা নায়িকাকে তুলে নিয়ে যায়। নায়কের হাতে পাঁচদিন সময় থাকে তার স্ত্রীকে উদ্ধারের। নায়ক সব বাধাবিপত্তি একা মোকাবিলা করে নায়িকাকে উদ্ধার করে।

এরূপ চিত্রায়ণের মাধ্যমে মূলত নায়িকাকে নায়কের মুখাপেক্ষী হিসেবে চিত্রিত করে প্রকৃতপক্ষে নায়কের মহত্ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও বীরত্ব বর্ণিত হয়েছে। এই ধরনের চিত্রায়ণ প্রকৃতপক্ষে জেন্ডার অসংবেদনশীলতার প্রকাশ।

৮.৪ নায়ক বলেই অন্যায় নয়

বাংলা চলচ্চিত্রে নায়ক নানা অন্যায়ে লিপ্ত হয়। *খোঁজ দ্যা সার্চ* সিনেমাতে দেখি নায়ক মেজর হিসেবে কাজ করে। কিন্তু সে সমানে সন্ত্রাসীদের গুলি করে খুন করে। আইনের লোক হয়েও সে হত্যা করে বিভিন্ন লোকজনকে। কিন্তু নায়কের কোনো সাজা হয় না। তার খুন ও হত্যাকে অন্যায় হিসেবে দেখানো হয় না। বাকি দুটো চলচ্চিত্রেও একই দৃশ্য দেখা যায়। নায়ক যা করে তা সবই জনগণের মঙ্গলের জন্য। অথচ, একই ধরনের অপরাধের জন্য অন্যদের শাস্তি পেতে হয়, কিন্তু নায়কের বেলায় শাস্তি না হয়ে বরং নানাভাবে তাকে প্রশংসিত করা হয়।

উল্লিখিত আচরণগুলো খল বা অন্যান্য চরিত্র করলে তা অন্যায় এবং চারিত্রিক ও নৈতিক স্খলন হিসেবে চিত্রিত হতো। কিন্তু নায়কের ক্ষেত্রেই একমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে।

আমরা জানি রেপ্রিজেন্টেশন হল এমন একটি প্রক্রিয়া যার মধ্যে একটি সংস্কৃতির মধ্যে অর্থ উৎপাদন ও বিনিময় হয়ে থাকে। এখানে ভাষা, চিহ্ন ও ইমেজের মাধ্যমে অর্থ নির্দেশ ও উপস্থাপন করা হয়। যেমন, চলচ্চিত্রের মাধ্যমেই আমরা শিখছি নায়কের কী ভূমিকা থাকা উচিত, নায়ক দেখতে কেমন হবে, নায়কের কী করা উচিত ইত্যাদি। পূর্ব থেকেই নায়ক সম্পর্কে আমাদের মধ্যে একটি ধারণা তৈরি হয়ে আছে এবং নায়ক সম্পর্কে এই ধারণা চলচ্চিত্রই তৈরি করে দিয়েছে। পূর্বের চলচ্চিত্রে নায়ককে যেভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে আমরা সব চলচ্চিত্রে নায়ককে সেই ভূমিকাতেই দেখতে পছন্দ করি। উপরিউক্ত আলোচনার মাধ্যমে বলা যেতে পারে যে, উল্লেখিত তিনটি চলচ্চিত্রে নায়ককে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যা সমাজের বিদ্যমান ধারণারই প্রতিফলন। নায়কের বক্তব্য এবং তার সকল কাজের মাধ্যমে আমাদের সামাজে নায়ক সম্পর্কে যে বিদ্যমান ধারণা রয়েছে তাই এই তিনটি চলচ্চিত্রে ফুটে উঠেছে। তাই গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলের আলোকে বলা যেতে পারে যে, এই গবেষণাকর্মের সাথে রেপ্রিজেন্টেশন তত্ত্বের সামঞ্জস্য রয়েছে।

৯.০ উপসংহার

অনন্ত জলিলের চলচ্চিত্রে নায়ক-নির্মাণ শীর্ষক গবেষণার মূল লক্ষ্য ছিলো অনন্ত জলিল অভিনীত তিনটি চলচ্চিত্রে নায়ক-নির্মাণের স্বরূপ অনুসন্ধানের মাধ্যমে তার চলচ্চিত্রে সার্বিকভাবে নায়কের নির্মাণরীতি আবিষ্কার করা। বিশ্লেষণে দেখা যায়, নায়কের চিত্রায়ণে শৌর্য-বীর্যের প্রকাশসহ প্রবল পুরুষের চিত্রায়ণ প্রতিটি চলচ্চিত্রেই লক্ষণীয়। নায়ককে অনেক বেশি সহিংস হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। নায়িকা ও অন্য চরিত্রগুলো নায়ককে শ্রেষ্ঠ করার জন্যই কাজ করছে।

গবেষণার প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, নির্বাচিত তিনটি চলচ্চিত্র বিশ্লেষণে নায়ককে একমাত্র ক্ষমতাবান, সাহসী, ও প্রবল পুরুষ হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। নায়ক এমন কোনো কাজ নেই যেটা পারে না। যেমন, ভিলেন তাকে গুলি করলে তার গায়ে লাগে না। সে নিজে যখন গুলি করা শুরু করে তখন তার গুলি যেন শেষ হয় না। সে একাই সন্ত্রাসীদের সাথে লড়াই করে। সবাই তার কাছে হার মানে। এভাবে নায়ককে অতিমানব করা হয়েছে। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, নায়িকার সাথে নায়কের সম্পর্ক উর্ধ্বতন-অধস্তনের। নায়ক নায়িকার উদ্ধারকর্তা। নায়কের শৌর্য-বীর্যে নায়িকা অবদমিত। এভাবেই নায়িকা নির্মাণের বিপরীতে নায়ক নির্মাণ করা হয়েছে। সিনেমার গল্পের মধ্যে যেসব সমস্যা আছে সেটা সমাধানে নায়কই একমাত্র ব্যক্তি। সে তার পরিবারকে রক্ষা করে, নায়িকা বিপদে পড়লে তাকে উদ্ধার করে। এখানে নায়ক সর্বময় সমস্যার সমাধানকারী হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে।

গবেষণায় দেখা যায় চলচ্চিত্র তিনটি কেবল নায়ক-নির্ভরই নয়, নায়ক চরিত্রটিকে একমাত্র সুপুরুষ, শক্তিমান, বুদ্ধিমান, দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ও সর্বকাজে সক্ষম হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। অন্য চরিত্র যে কাজ করতে ব্যর্থ হয় কিংবা দায়িত্বহীনতার পরিচয় দেয়, সেই একই কাজে নায়ক দায়িত্ববান থাকে এবং যথাযথভাবে কাজটি বাস্তবায়ন করে। তাই, নায়কের এরূপ চিত্রায়ণ অনেক সময় বাস্তবতা-বিবর্জিত ও অতিমানবীয় বলে মনে হওয়া অসঙ্গত নয়।